ভূমিকা

প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য সম্বন্ধে বাঙ্গালী এখনও আশানুরূপ সচেতন নহে। ইহা দুঃখের কথা সন্দেহ নাই। এই কথা সুনিশ্চিত যে বাঙ্গালীর প্রাচীন ভাবধারা, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি বুঝিতে হইলে প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের চর্চ্চা নিতান্ত আবশ্যক। আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্য প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যেরই উত্তরাধিকারী। সব দেশের প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্য সম্বন্ধেই এই কথা প্রযোজ্য। এমতাবস্থায় বাঙ্গালা সাহিত্য আলোচনা প্রসঙ্গে প্রাচীন যুগে ইহার উদ্ভব ও পরিপুষ্টির ধারাবাহিক ইতিহাস জানা একান্ত প্রয়োজন। খৃঃ ৮ম হইতে ১৮শ শতাব্দী পর্যান্ত বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রাচীন যুগ। তাহার পর হইতে বর্ত্তমানকাল পর্যান্ত আধুনিক যুগ।

বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রাচীন যুগ কতকগুলি সমস্যার, সুতরাং অসুবিধার, সৃষ্টি করিয়াছে। বাঙ্গালা সাহিত্য কবে হইতে আরম্ভ হইয়াছে? সাহিত্যের বাহন ভাষা, সুতরাং বাঙ্গালা ভাষাই বা কত পুরাতন? বাঙ্গালা দেশের আয়তন কত বড় এবং ইহার অধিবাসী সকলেই কি "বাঙ্গালী" অর্থাৎ বাঙ্গালা ভাষায় কথা বলে? বাঙ্গালী জাতির উদ্ভব কোন্ সময় হইতে আরম্ভ হইয়াছে? এইরূপ নানা প্রশ্ন স্বতঃই মনে উদিত হয়। এই প্রকার প্রশ্ন বা সমস্যাগুলি সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য তাহা এই স্থানে উল্লিখিত হইতেছে। এই সম্বন্ধে যুক্তি-তর্কের কণ্টকাকীর্ণ পথ পরিত্যাগ করিয়া আপাততঃ গ্রহণযোগ্য মীমাংসা-গুলিই লিপিবদ্ধ করা গেল, কারণ স্থানাভাব এবং যুক্তি-তর্কের সীমাহীন অবকাশ।

খৃঃ ৮ম শতাব্দীতে বাঙ্গালা ভাষার আরম্ভ হইয়াছে এবং খৃঃ ৯ম শতাব্দী হইতে সাহিত্যের বিকাশ আরম্ভ হইয়াছে ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। খৃঃ ৮ম শতাব্দী পর্য্যান্ত প্রাকৃত ও অপভ্রংশ ভাষার যুগ এবং এই ৮ম শতাব্দীতেই সম্ভবতঃ বাঙ্গালা ভাষার প্রথম উন্মেষ হয়। ইহার পর বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য প্রথম-দিকে কতিপয় শতাব্দী পর্য্যন্ত প্রাকৃত ও অপভ্রংশ ভাষার লক্ষণাক্রান্ত বলা চলে। এমনকি এই সময় "বাঙ্গালা" বা "বঙ্গ" কথাটির স্থলে অনেক কাল যাবৎ "প্রাকৃত" এবং "ভাষা" কথাটির প্রচলন ছিল। "বঙ্গ" বা "বাঙ্গালা" কথাটি "প্রাকৃত" অথবা "ভাষা" কথাটির স্থানে ঠিক কবে হইতে ব্যবহৃত হইতেছে বলা কঠিন। তবে, "প্রাকৃত" অথবা "ভাষা" কথার স্থানে "গৌড়ীয়" ও "বঙ্গ"

শব্দ দুইটির প্রয়োগ খৃঃ ১৬শ ও ১৭শ শতাব্দীতে যথেষ্ট প্রাপ্ত হওয়া যায়। ত্রিপুরার রাজপঞ্জীতে বাঙ্গালা ভাষার উল্লেখ করিতে "সুভাষা" কথাটির ব্যবহার বেশ মনোরম। রাগ-রাগিণীতে ব্যবহৃত "বাঙ্গাল" রাগ কথাটিও এই উপলক্ষে লক্ষ্য করা যাইতে পারে।

বাঙ্গালা দেশের আয়তন বিভিন্ন উদ্দেশ্যে বিভিন্ন রূপ ধরা হইয়া থাকে। পূর্ব্ব-ভারতের গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র নদের পলিবাহিত শস্যশ্যামল সমতলভূমিই প্রাকৃতিক বা ভৌগোলিক বাঙ্গালা দেশ। উহা এখনকার শাসনসম্পর্কিত একটি প্রদেশমাত্র। জাতি, ভাষা ও সংস্কৃতির ভিত্তিতে বিবেচনা করিলে দেশটির আয়তন আরও বড়। এই হিসাবে দেশটির আয়তন বর্দ্ধিত করিতে হয়। বিহার, ছোটনাগপুর, উড়িষ্যা এবং আসামের অংশবিশেষ ইহার অন্তর্গত করা সঙ্গত। সমগ্র আসাম প্রদেশ তো বটেই, সমগ্র ছোটনাগপুর বিভাগকে বাঙ্গালা দেশে আগত প্রাচীন জাতিগুলির সংস্পর্শ, সংঘর্ষ ও উপনিবেশের ক্ষেত্র হিসাবে বৃহত্তর বাঙ্গালা দেশের অন্তর্ভুক্ত করিলে কোনরূপ আপত্তি হওয়া উচিত নহে।

নানা বিভিন্ন জাতি পূর্ব্ব-ভারতে ছড়াইয়া পড়িবার ফলে শুধু বর্ত্তমান বাঙ্গালা দেশেই ইহারা বাসস্থান নির্ম্মাণ করে নাই; তাহারা সমগ্র বিহার আসাম, ছোটনাগপুর, উড়িষ্যা এবং উত্তর-ব্রহ্ম, মান্দ্রাজ ও মধ্যপ্রদেশের কিয়দংশ তথা পূর্ব্বহিমালয়ের পার্ব্বত্য অঞ্চল ব্যাপিয়া বিভিন্ন সময়ে বসতিস্থাপন করিয়াছিল। ইহার একটি প্রধান অংশই প্রকৃত বাঙ্গালা দেশ। তাহা বর্ত্তমান বাঙ্গালার সমতল ভূমি ও তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থ সমতলভূমি এবং পার্ব্বত্য অঞ্চল লইয়া গঠিত। এই ভূভাগ অবশ্য গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের পলিবাহিত সমতল ভূমি অপেক্ষা বৃহত্তর এবং ইহার প্রাকৃতিক সীমা নির্দ্দেশ করাও কঠিন নহে। সম্ভবতঃ "বাঙ্গালা" দেশ বুঝাইতে ইহা সঙ্কীর্ণ অর্থে গ্রহণ না করিয়া বৃহত্তর অর্থে গ্রহণ করিলে বাঙ্গালার প্রাচীন সাহিত্য ও সংস্কৃতি বুঝিতে অধিক সুবিধা হয়।

প্রাচীনকালে যে জাতিগুলি পূর্ব্ব-ভারতে বা "প্রাচ্য" দেশে আগমন করিয়া বাঙ্গালা দেশে বসতিস্থাপন করিয়াছে তাহারা প্রধানতঃ "অষ্ট্রিক" গোষ্ঠী-ভুক্ত। ইহাদের ছাড়া (প্রায় অবলুপ্ত নেগ্রিটো ভিন্ন) পামিরীয়, মঙ্গোলীয়, দ্রাবিড় ও আর্য্যগণের নাম করা যাইতে পারে। আমাদের ধারণা এই সব জাতি প্রাথমিক নানা সংঘর্ষের পর ক্রমশঃ সকলে প্রতিবেশীর মত সৌহার্দ্দপূর্ণ মনোভাব লইয়া বাস করিতে অভ্যাস করে। ইহার ফলে পরস্পরের মধ্যে কিছু পরিমাণে বৈবাহিক সম্বন্ধও স্থাপিত হয়। এই সমস্ত কারণপরম্পরা বাঙ্গালী জাতি

প্রধানতঃ "অষ্ট্রো-আল্লাইন" (পামিরীয়) নামক মিশ্রজাতিতে পরিণত হইয়াছে। ক্রমে এই জাতির রক্তের সহিত অপেক্ষাকৃত অল্প-পরিমাণে মঙ্গোলীয়, দ্রাবিড় এবং আর্য্যরক্তও সংমিশ্রিত হইয়াছে। ইহাদের বাহ্যিক সংস্কৃতি এবং আচার বৈদিক ও পৌরাণিক আর্য্যসম্ভূত হইলেও অন্তরে ইহারা অষ্ট্রো-আল্লাইন সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত বলা যাইতে পারে। এই দিক দিয়া ইহাদের সহিত দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার মালয় ও অন্যান্য জাতিগুলির ভাষা ও সংস্কৃতিগত নৈকট্য খুব অধিক। অপরপক্ষে ইহারা সূর্য্যপূজা ও মা দুর্গার পূজার মধ্য দিয়া পশ্চিম এসিয়ার মিটানি ও ইরাণী প্রভৃতি জাতির সহিত প্রাচীন আর্য্যজাতির সংস্রবে সম্বন্ধযুক্ত হইয়াছে।

প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য আলোচনা করিতে গেলে এই জাতিগত ও সংস্কৃতিগত বৈশিষ্ট্যগুলি স্মরণ রাখিতে হইবে। ইহা ছাড়া এই সাহিত্য আলোচনা করিতে গেলে আরও কতিপয় বিষয় বিবেচনাসাপেক্ষ। অতি প্রাচীন যুগে অর্থাৎ প্রাগৈতিহাসিক যুগে এই প্রাচ্যের প্রধান ভূখণ্ড বাঙ্গালা দেশের প্রাচীন অধিবাসীগণ সম্বন্ধে আমরা কতটুকু জানি? বৈদিক ও পরবর্ত্তী পৌরাণিক যুগে এই অঞ্চলের সম্যক পরিচয় কি ছিল? তাহার পর, বৌদ্ধ ও তান্ত্রিক যুগে এই ভূভাগের অধিবাসীগণের সম্বন্ধে কি পরিমাণ সংবাদ আমরা রাখিয়া থাকি? বৌদ্ধযুগে মৌর্য্যসম্রাট অশোকের ও তৎপূর্ব্ববর্ত্তী হিন্দু-ধর্ম্মাবলম্বী মৌর্য্যসম্রাট চন্দ্রগুপ্তের সময়ে অর্থাৎ খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীতে বাঙ্গালা দেশ মৌর্য্যসাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল এবং এই সময়ের বাঙ্গালা দেশ সম্বন্ধে অনেক কিছু জানিবার আছে। তখন পর্য্যন্ত বাঙ্গালা ভাষার জন্ম হয় নাই।

এই সময়ে রাজশক্তিপুষ্ট বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবে বাঙ্গালী জাতিকে ঐক্য ও সংহতির যে স্তরে নিয়া পৌঁছাইয়াছিল তাহার ফলেই বাঙ্গালায় একটি নিজস্ব ভাষাগত ঐক্যের পথ প্রশস্ত হয়। তাহার পর খৃঃ ৪র্থ ও ৫ম শতাব্দীতে আসিল গুপ্তযুগ। গুপ্ত সম্রাটগণ হিন্দু ছিলেন। সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত ও চন্দ্রগুপ্ত বৌদ্ধগণের আদরণীয় পালি-ভাষার স্থলে প্রাকৃত ও সংস্কৃতের সমাদর করিতে আরম্ভ করিলেন। তাহার পর খৃঃ ৭ম শতাব্দীতেও বাঙ্গালার সম্রাট শশাঙ্কের পৃষ্ঠপোষকতায় হিন্দু আদর্শই পূর্ব্ব-ভারতের প্রাধান্য লাভ করিল। যদিও গুপ্তযুগে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে (খৃঃ ৫ম শতাব্দী) চৈনিক পরিব্রাজক ফাহিয়ান এবং কান্যকুব্জের বৌদ্ধ সম্রাট হর্ষবর্দ্ধন ও পূর্ব্ব-ভারতের হিন্দু সম্রাট শশাঙ্কের সময়ে (খৃঃ ৭ম শতাব্দী) অপর চৈনিক পরিব্রাজক হুয়েন সাং ভারতে আগমন করিয়া এতদ্দেশে বৌদ্ধধর্ম্মের বিস্তৃতি সম্বন্ধে অনেক

কথা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন তথাপি এই কথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে এই দুই সময়েই বৌদ্ধধর্ম্মের স্থলে হিন্দুধর্ম্ম পুনরুত্থান করিতে সক্ষম হইয়াছিল। কারণ পূর্ব্বভারতের রাজশক্তি এই ধর্ম্মকে তখন সাহায্য করিতেছিল।

পুনরায় খৃঃ ৮ম শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যের প্রসিদ্ধ শৈব সন্ন্যাসী শঙ্করাচার্য্যের অভ্যুত্থানহেতু সমগ্র ভারতে বৈদান্তিক মত ও শৈবধর্ম্মের প্রচার আরম্ভ হইল এবং বৌদ্ধধর্ম্ম ক্রমে ভারত হইতে অন্তর্হিত হইল। মুসলমান আক্রমণও ইহার অন্যতম কারণ সন্দেহ নাই। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্মের ভারতে অবসানের পূর্ব্বে শেষ একবার ইহার অভ্যুত্থান হইয়াছিল। তাহা খৃঃ ৮ম-১০ম শতাব্দীতে উত্তর-বঙ্গে পালরাজগণের রাজত্বকালে। এই সময়ে পশ্চিম-বঙ্গে হিন্দু শূররাজবংশ হিন্দুধর্ম্ম ও ইহার আদর্শ স্থাপনে প্রচুর চেষ্টা করে এবং ইহাদের পরবর্ত্তী উত্তরাধিকারী সেনরাজবংশের সময় (খৃঃ ১১শ-১২শ শতাব্দী) পালরাজগণের বৌদ্ধ আদর্শের স্থলে সেনরাজগণের হিন্দু আদর্শ বাঙ্গালা দেশে প্রাধান্যলাভ করিতে সমর্থ হয়। সুতরাং দেখা যায় যে বাঙ্গালা দেশে কোন সময়ে বৌদ্ধমত এবং কোন সময়ে হিন্দুমত প্রবল হয় এবং বিভিন্ন সময়ের রাজশক্তি হয় বৌদ্ধধর্ম্মের নতুবা হিন্দুধর্ম্মের প্রচুর সহায়তা করে। ইহার পর মুসলমান অধিকারে এবং নানা কারণপরম্পরা এতদ্দেশে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রায় সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় এবং রাজশক্তির সাহায্যের অভাবে ব্রাহ্মণগণের নেতৃত্বে হিন্দুধর্ম্ম খৃঃ ১৪শ-১৫শ শতাব্দীতে নূতন আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়। পুনরায় এই খৃঃ ১৫শ শতাব্দীতেই মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের ফলে রাজশক্তির সাহায্য ভিন্নই হিন্দুধর্ম্ম সাম্যবাদ ও প্রেমধর্ম্মের ভিত্তিতে নূতন প্রেরণা লাভ করে অথচ বৌদ্ধধর্ম্ম এই সময়ে রাজশক্তির সাহায্যের অভাবে এদেশ হইতে বহু সংঘারাম এবং নালান্দা ও বিক্রমশীলার বিশ্ববিদ্যালয়সহ প্রায় বিলুপ্ত হইয়া যায়।

একটি কথা এই স্থানে উল্লেখযোগ্য, তাহা তান্ত্রিকতা। এই মত শৈবধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া সম্ভবতঃ বেদ-পূর্ব্বযুগ হইতে এই দেশে বিস্তৃতি লাভ করে এবং পামিরীয় জাতি কর্ত্তৃক উত্তরকালে বাঙ্গালা দেশে আনিত হয়। বৌদ্ধসমাজে যেমন দলাদলির ফলে "হীনযানী" ও "মহাযানী" নামক দুইটি ধর্ম্মসম্প্রদায়ের উদ্ভব হয় তদ্রূপ হিন্দুসমাজেও "বৈদিক" ও "পৌরাণিক" দুই আদর্শে অনুপ্রাণিত ধর্ম্মসম্প্রদায়ের উৎপত্তি হয়। ক্রমে দেখা যায় এই সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে তান্ত্রিকতা প্রবেশ করিয়া বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে এক অপূর্ব্ব সমন্বয় সাধন করে।

খৃ: চতুর্থ শতাব্দীতে গুপ্তযুগ হইতে আরম্ভ করিয়া খৃ: দ্বাদশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার শূর ও সেনরাজবংশের সময় পর্য্যন্ত বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের স্থলে ক্রমশঃ পৌরাণিক ব্রত, নিয়ম ও পূজা প্রচারিত হইতে লাগিল। আবার খৃ: সপ্তম শতাব্দীতে সম্রাট শশাঙ্ক সম্ভবত: তান্ত্রিক শাক্তমত প্রচারে অধিক আগ্রহান্বিত ছিলেন। একদিকে এই তান্ত্রিক মত খৃ: ৮ম শতাব্দীতে হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় সমাজে নূতনভাবে প্রবিষ্ট হইয়া উভয়েরই রূপ পরিবর্ত্তনে সাহায্য করিয়াছিল অপরদিকে শঙ্করাচার্য্যের বৈদান্তিক মত এই খৃ: অষ্টম শতাব্দীতে প্রচারিত হইয়া মায়াবাদের সাহায্যে জীবনের দৃষ্টিভঙ্গীর এক বিশেষ পরিবর্ত্তন সাধন করিয়াছিল। আরও পরবর্ত্তীকালে রামানুজের বৈষ্ণব মত বাঙ্গালা দেশে অভিনব জীবনের সঞ্চার করে। মিথিলার ন্যায় ও জ্যোতিষশাস্ত্র এবং শৈব সম্প্রদায়ের যোগশাস্ত্র জাতির দৃষ্টিভঙ্গীতে যে অভূতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন সাধন করে তাহার ফলও সুদূরপ্রসারী হয়। প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে এই সমস্ত মতের ইঙ্গিত সুস্পষ্ট।

উল্লিখিত বিষয়গুলি আলোচনা করিয়া বলা যাইতে পারে যে অন্ততঃ খৃ: অষ্টম শতাব্দী হইতেই প্রাকৃত ও অপভ্রংশ ভাষার মধ্য দিয়া বাঙ্গালা ভাষার শৈশব অবস্থা। ভাষা ভাবকে আশ্রয় করিয়া চলে। সুতরাং এই সব বিভিন্ন প্রকার মত একটি ভাবধারাকে প্রধানতঃ অবলম্বন করিয়া নানা শাখা-প্রশাখা সহ খৃঃ নবম ও দশম শতাব্দী হইতেই বাঙ্গালা সাহিত্যের বীজবপন করে। খৃ: ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতেই এই নবজাত সাহিত্য প্রকৃত সাহিত্যের রূপ পরিগ্রহ করিয়া খৃ: পঞ্চদশ শতাব্দীতে পূর্ণাঙ্গতা প্রাপ্ত হয়।

প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য প্রায় সবই ছন্দে রচিত। এই ছন্দ দুই প্রকারের ছিল—"পয়ার" ও "লাচাড়ী" (পরবর্ত্তীকালের আংশিক ত্রিপদী)। ইহা সমস্তই রাগ-রাগিণী সংযোগে গীত হইত। সংস্কৃত ভাষায় কবিত্বপূর্ণ রচনাগুলি মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য, গীতিকাব্য বা চম্পূ (গদ্য-পদ্য মিশ্রিত)। প্রায় সব বাঙ্গালা রচনাই খণ্ডকাব্য ও গীতিকাব্য শ্রেণীভুক্ত বলা যাইতে পারে। খণ্ডকাব্যসমূহের ভিতরে ইতস্তত: কিছু কিছু মহাকাব্যের ছায়াও পড়িয়াছে। ইহার উদাহরণ মঙ্গলকাব্যসমূহ। আর গীতিকাব্যের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য।

প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে নাটক ও গদ্য রচনার একান্ত অভাব দেখা যায়। প্রায় সব রচনাই কোন ধর্ম্মভাবের প্রেরণার ফল। তবে আধুনিক নাটক ও উপন্যাসের উপাদান এই সাহিত্যে খুঁজিলেও পাওয়া যাইবে কারণ উহা শাশ্বতধর্ম্মী। এই সাহিত্য পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে খৃ: ১৫শ

শতাব্দী পর্য্যন্ত মূল কবির স্বহস্তলিখিত পুথির একান্ত অভাব। এইরূপ পুথি মোটেই পাওয়া যায় না, অথবা দুর্লভ। যে সব পুথি পাওয়া যায় তাহা কবির নিজ পুথি নহে। ইহা অনুলিপিকার কর্তৃক লিখিত পুথি। প্রাচীনকালে, বিশেষতঃ মধ্যযুগে, এইসব ধর্ম্মানুগ সাহিত্যের গায়কগণের নানা দল ছিল। অনেক গায়কই অধিকাংশ সময়ে আবার পুথির লেখক। এইসব পুথি নকলকারীগণ নিজরচিত অনেক ছত্রও লেখাগুলির মধ্যে নিবদ্ধ করিয়াছেন। সম্ভবতঃ আবার অনেক পুরাতন ও লুপ্তপ্রায় পুথির সংস্কার করিয়া ও বিচ্ছিন্ন অংশগুলি জোড়া লাগাইয়া নানা সময়ের নানা কবির রচনা সংযোগে পুথিসমূহ সম্পাদিত হইত। এই জাতীয় পুথি বহু কবির ভণিতাযুক্ত হইবার ইহাই কারণ। ইহা ভিন্ন নানা প্রতিদ্বন্দ্বী গায়কদলের মধ্যে প্রচলিত বিভিন্ন কবির পুথি গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে গীত হইবার ফলে ও খ্যাতি অর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন গ্রামে নকলের সময় কিছু পরিবর্ত্তিত কলেবর পরিগ্রহ করিত। কোন একজন মূল কবির পুথিখানি এইরূপে নানা কবির হস্তচিহ্নিত হইয়া বিভিন্নরূপে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হওয়াতে এইরূপ কাব্যসম্বন্ধে সমালোচনা বিশেষ দুরূহ হইয়া পড়িয়াছে। উদাহরণস্বরূপ, শূন্যপুরাণ ও রামাই পণ্ডিতের কাল, কৃত্তিবাসের কাল ও পৃষ্ঠপোষক রাজার নাম, কবিকঙ্কণ-চণ্ডীতে উল্লিখিত রাজা মানসিংহ, ধর্ম্ম-মঙ্গলের গৌড়েশ্বর ও ময়ূরভট্টের কথা, মালাধর বসুর পৃষ্ঠপোষক সুলতান ও চণ্ডীদাস-সমস্যা প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে। বর্ত্তমানকালে এইরূপ পুথির সম্পাদনা বিশেষ কঠিন কার্য্য। বহুপ্রকার পাঠান্তর ও অতিরিক্ত পাঠের বাহুল্য ইহাতে যে বিভ্রম সৃষ্টি করে তাহার বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন।

বিষয়-বস্তুর পরিধি অল্প অথচ কোন একটি বিষয়ে কবি অনেক। নকলকারী ও পরিবর্ত্তনকারী কবির সংখ্যা ততোধিক। সুতরাং অনেক প্রাচীন কাব্যের সঠিক সময় নির্দ্দেশ ও আলোচনা একরূপ অসাধ্যসাধন সন্দেহ নাই। তদুপরি দুর্ভাগ্যক্রমে কোন মূল কবির সময় ও পরিচয়জ্ঞাপক পত্রখানিরও অনেক কীটদষ্ট এবং অযত্নরক্ষিত পুথিতে অভাব। এমনকি সব পত্রের মধ্যে শুধু এই বিশেষ প্রয়োজনীয় পত্রখানির অভাব ঘটিবার কারণ নিয়াও অনেক যুক্তিতর্কের পথ প্রশস্ত করিয়াছে। সময় সময় কীটদষ্ট পুথিতে কতিপয় নিতান্ত আবশ্যকীয় অক্ষর ও সময়জ্ঞাপক অঙ্কের সম্পূর্ণ অথবা আংশিক অভাব সমালোচনার পথ আরও জটিল করিয়া তোলে। ইহার উপর কোন পুথির স্থানে স্থানে পরিবর্ত্তনের মধ্যে অভিসন্ধির আরোপ করিবার সুযোগের পথও যে না রহিয়াছে এমন নহে। প্রাচীন পুথির পাঠোদ্ধারই এক কঠিন ব্যাপার,

তাহার উপর উল্লিখিত অসুবিধাগুলি বিশেষ করিয়া খণ্ডিত পুথির উপলক্ষে সত্য নির্দ্দেশের পথ দুর্গম করিয়া তুলিয়াছে।

এত অসুবিধার মধ্যে আবার পাশ্চাত্য বিশেষজ্ঞগণের পুরাতন রীতি অনুসরণ করিয়া এদেশের পণ্ডিতবর্গের মধ্যে কেহ কেহ এই প্রাচীন বাঙ্গালা পুথিগুলির ভিতরে যত্রতত্র বৌদ্ধগন্ধ আবিষ্কারের চেষ্টা করিয়াছেন। ইহার ফলে তাঁহারা বিষয়বস্তু ও রচনাগুলির সরল ব্যাখ্যা না করিয়া একটা জটিল ও কুহেলিকাচ্ছন্ন পথ আবিষ্কারের প্রয়াস পাইয়াছেন। দুঃখের বিষয় ইহাতে সত্য আবিষ্কারের পথ সরল ও সুগম না হইয়া যথেষ্ট বিঘ্নসঙ্কুল হইয়াছে।

প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের সময় খৃ: ৮ম শতাব্দী হইতে খৃ: ১৮শ শতাব্দী পর্য্যন্ত ধরা যাইতে পারে। আবার এই সাহিত্যকে দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে, যথা আদিযুগ ও মধ্যযুগ। খৃ: ৮ম শতাব্দী হইতে খৃ: ১২শ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত, অর্থাৎ মুসলমানগণের বাঙ্গালায় আগমন পর্য্যন্ত, আদিযুগ এবং অবশিষ্ট প্রায় ছয়শত শতাব্দী অর্থাৎ ইংরেজাধিকারের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের মধ্যযুগ। প্রাচীন যুগের পর বাঙ্গালা সাহিত্যের বর্ত্তমান যুগ খৃ: ১৯শ শতাব্দী হইতে আরম্ভ হইয়া এখন চলিতেছে।

আদিযুগের ছড়া ও গানগুলি কোন বিশেষ দেবতা উপলক্ষে রচিত নহে, থাকিলেও খুব অল্প। সাধারণত: ইহা সমাজ-জীবনের রীতি-নীতি, কৃষি ও জ্যোতিষতত্ত্ব এবং দার্শনিক ও তাত্ত্বিক মতবাদপূর্ণ কতগুলি জ্ঞানগর্ভ উপদেশ মাত্র। কিন্তু মধ্যযুগের ছড়াগুলি কোন বিশেষ দেবতা উপলক্ষে রচিত এবং সাহিত্যিক সৌন্দর্য্যপূর্ণ কাহিনী। ইহাও গীত হইত। এই ছড়াগুলির কাব্যের মর্য্যাদালাভ করিতে দীর্ঘসময় অতিবাহিত হইয়াছিল। একমাত্র বৈষ্ণব অংশছাড়া যাঁহারা মধ্যযুগের কাব্যগুলিকে সাহিত্যিক মর্য্যাদা দিতে অনিচ্ছুক আমরা তাঁহাদের সহিত একমত নহি। মানবজীবনের তথা সমাজ-জীবনের প্রতিচ্ছবি যদি সাহিত্য হয়, সার্থক চরিত্র সৃষ্টি যদি সাহিত্যের অঙ্গ হয়, বর্ণনার সৌন্দর্য্য ও ভাবমাধুর্য্য যদি সাহিত্যে স্থান পায়, বিশেষত: গভীর অন্তর্দৃষ্টি এবং আন্তরিকতা ও কবিত্বপূর্ণ রচনা যদি সাহিত্যরূপে গণ্য হয়, তবে মধ্যযুগের কাব্যগুলিও সাহিত্যপদবাচ্য।

মধ্যযুগের বাঙ্গালা সাহিত্যের সময় ও শ্রেণীবিভাগ আর একটি সমস্যা বটে। ইহাকে শ্রেণী (type) ও কালহিসাবে বিভক্ত করিয়া আলোচনা করা যাইতে পারে। সময়ের দিকে দেখা যায় প্রায় প্রতি একশত বৎসর পরে একশত বৎসর যাবৎ এই সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। এইরূপভাবে

গ্রহণ করিলে দেখা যাইবে স্থূলতঃ ১৪শ, ১৬শ ও ১৮শ শতাব্দীতে বাঙ্গালা সাহিত্য যত সমৃদ্ধ ১৩শ, ১৫শ ও ১৭শ শতাব্দীতে তত নহে। শ্রেণীর দিক দিয়া মধ্যযুগের বাঙ্গালা সাহিত্যের তিনটি উপ-বিভাগ সুস্পষ্ট। ইহা লৌকিক সাহিত্য, অনুবাদ সাহিত্য ও বৈষ্ণব-সাহিত্য। ইহা ভিন্ন ইহার শেষের দিকের কবিগান, গীতিকা (পূর্ব্ব-বঙ্গ গীতিকা) প্রভৃতি নিয়া "জনসাহিত্য" নামে একটি উপ-বিভাগও কল্পনা করা যাইতে পারে।

লৌকিক, অনুবাদ ও বৈষ্ণব সাহিত্যত্রয়ের তুলনামূলক আলোচনা করিলে দেখা যায় খৃঃ ১৪শ শতাব্দী পর্য্যন্ত মধ্যযুগের বাঙ্গালা সাহিত্যের বাল্য, খৃঃ ১৬শ শতাব্দী পর্য্যন্ত যৌবন এবং ইহার পরে খৃঃ ১৮শ শতাব্দী পর্য্যন্ত বার্দ্ধক্যের লক্ষণযুক্ত। খৃঃ ১৬শ শতাব্দীতে লৌকিক, অনুবাদ ও বৈষ্ণব এই তিন শাখাই প্রচুর সমৃদ্ধ এবং পরস্পর ভাব-বিনিময়ে গৌরবযুক্ত।

খৃঃ ১৫শ শতাব্দীতে পাঠান সুলতান হুসেন সাহ বাঙ্গালা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছিলেন। একই সময়ে শ্রীচৈতন্যদেবের দেব-চরিত্র বৈষ্ণব সাহিত্যে প্রতিফলিত হইয়াছে এবং সাহিত্যের অপর শাখাগুলিকেও অল্পবিস্তর প্রভাবিত করিয়াছে। এতৎ সত্ত্বেও এই দুই পুরুষসিংহ ও নরদেবতার নামে কোন বিশেষ সময়ের বাঙ্গালা সাহিত্যকে চিহ্নিত করা সমীচীন কি না তাহা বিবেচ্য। সময় বিশেষের রাজনৈতিক, ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ও সামাজিক অবস্থার সহিত রাজশক্তির উৎসাহ অথবা দেবোপম মানব-চরিত্রের আদর্শের যোগাযোগ এবং একত্রিভূত ফল বাঙ্গালা সাহিত্যের অংশবিশেষে মূর্ত্ত হইয়াছে। কোন বিশেষকালের সাহিত্যবিশেষের উন্নতি ও বৈশিষ্ট্যের ইহা আংশিক কারণ হইলেও একমাত্র কারণ নহে। রাজনৈতিক অথবা ধর্ম্মজগতে রাজশক্তি অথবা দেবোপম চরিত্রের যত প্রভাবই থাকুক না কেন সাহিত্য-সৃষ্টি করিতে উহা নিশ্চয়ই সীমাবদ্ধ এবং অন্য কারণপরম্পরা-সাপেক্ষ।

সাহিত্যকে উপরিলিখিতভাবে কোন ব্যক্তিবিশেষের নামে চিহ্নিত না করিয়া শ্রেণীহিসাবে বিভাগ করাই অধিক সঙ্গত। একই বিষয়বস্তু নিয়া বহু কবি কাব্য রচনা করিয়াছেন বলিয়া সেই জাতীয় কাব্যসমূহ একযোগে আলোচনা করাই সুবিধাজনক।

এই ধর্ম্মানুগ সাহিত্য শেষ সময়ে রূপান্তরিত অবস্থায় জনসাহিত্যের পুষ্টিসাধন করে। ধর্ম্ম বা রাজানুগ্রহপুষ্ট কাব্যসাহিত্য প্রথমে উচ্চশ্রেণীর ব্যক্তিবর্গের মনোরঞ্জন করিতে গিয়া ক্রমে সর্ব্বশ্রেণীর জনসাধারণের প্রীতি

আকর্ষণ করে এবং ইহার ফলে এই সাহিত্য ধীরে ধীরে বিভিন্ন আকারে কবি, যাত্রা ও কীর্তন প্রভৃতি গানে পরিণত হয়।

যুগে যুগে রুচির পরিবর্তন হয়। সুতরাং সমাজের ভিতরে সাধারণ জনগণ কবিগান, যাত্রাগান, কীর্তনগান প্রভৃতিতে প্রচুর আনন্দলাভ করিবে ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই। মধ্যযুগের সাহিত্যের এই শেষ পর্য্যায়ে রাজনৈতিক বিপর্য্যয়ের যুগে বঙ্গবাসীর চরিত্রের যে পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল তাহাতে ধর্ম্মের আবরণ অনেক পরিমাণে ভেদ করিয়া ভারতচন্দ্রের আদিরসপূর্ণ কবিতার প্রতি (খৃঃ ১৮শ শতাব্দীতে) সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। ক্রমে ময়মনসিংহ ও পূর্ব্ব-বঙ্গের অন্যান্য স্থানে প্রচলিত গীতিকার মধ্যে দেবতার প্রতি নিবেদিত প্রেমের অভাব অথচ সাধারণ নর-নারীর মধ্যে সন্ত-জাগ্রত মানবীয় প্রেমের উচ্চ ও নব আদর্শ খৃঃ ১৯শ শতাব্দীতে দেবতার প্রভাবমুক্ত সাহিত্যের পথ প্রশস্ত করে। তদানিন্তন বৃটিশ শাসকবৃন্দ এবং খৃষ্টধর্ম্মের প্রচারকগণের স্বতন্ত্র উদ্দেশ্য ও প্রয়োজন বাঙ্গালা সাহিত্যের এই নূতন আদর্শ প্রচারে সাহায্য করে এবং তাহার আংশিক ফলেও এই সাহিত্যের রূপ একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া বর্ত্তমান যুগের বাঙ্গালা সাহিত্যের উদ্ভব হয়।

বাঙ্গালা সাহিত্য যে সময় কতক পরিমাণে অবজ্ঞাত ছিল সেই বিগত শতাব্দীর দুর্দ্দিনে রমেশচন্দ্র দত্ত ও রামগতি ন্যায়রত্ন প্রমুখ মহোদয়গণ আংশিক-ভাবে প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস প্রথম রচনা করিয়া সকলের দৃষ্টি এই দিকে আকৃষ্ট করেন। অবশেষে ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের একখানি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস প্রথম রচনা করেন। সাহিত্যের ইতিহাস হিসাবে ইহা একখানি অমূল্য গ্রন্থ। এই গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইলে বাঙ্গালা সাহিত্যের অনেক অপরিচিত অংশ জনসাধারণের দৃষ্টিগোচর হয় এবং তাহারা বাঙ্গালা সাহিত্যের বিপুল ঐশ্বর্য্য সম্বন্ধে অবহিত হয়। পরবর্ত্তী কয়েক সংস্করণ প্রকাশিত হওয়াতে অনেক সময়োপযোগী মূল্যবান তথ্য ইহার অন্তর্ভুক্ত হইয়া গ্রন্থখানির কলেবর ও মূল্য বৃদ্ধি করিয়াছে। বহু প্রাচীন কবি ও তাঁহাদের রচনা দীনেশচন্দ্র সেন কর্ত্তৃক সংগৃহীত হইয়াছে। এই দিক দিয়া এবং সুষ্ঠু সাহিত্য সমালোচনায় গ্রন্থখানি তুলনা-রহিত। এই গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার অনেক পরে, আধুনিককালে আরও কতিপয় প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস রচিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন অনেক বিশেষজ্ঞ প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের

বিভিন্ন দিক নিয়া আলোচনা করিয়াছেন। তথাপি দীনেশচন্দ্র সেনের গ্রন্থের গৌরব ম্লান হওয়া দূরে থাকুক ইহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন অব্যাহতই আছে। তথ্যসংগ্রহের জন্য এই গ্রন্থের সাহায্য একান্ত অপরিহার্য্য। যে পারিপার্শ্বিক অবস্থায় দীনেশচন্দ্র সেন তাঁহার অমূল্যগ্রন্থ রচনা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন এখন সেই অবস্থা নাই। প্রাচীন পুথি সংগ্রহ মানসে তিনি প্রচুর মনোবল দেখাইয়া ও দৈহিক কষ্ট সহ্য করিয়া গ্রামে গ্রামে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। এখন এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল। ত্রিপুরার তদানীন্তন মহারাজার (বীরচন্দ্র মাণিক্য) ন্যায় অনেক ধনী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির উৎসাহ ও আর্থিক সাহায্য লাভের সৌভাগ্য তাঁহার হইয়াছিল। তদুপরি পণ্ডিতসমাজ তাঁহাকে সর্ব্বদা সাহায্য করিতে উৎসুক ছিলেন। এই বিষয়ে ডাঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর নাম সর্ব্বপ্রথমে উল্লেখযোগ্য। এতদ্‌ব্যতীত স্যার জর্জ্জ গ্রিয়ারসন, স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, নগেন্দ্রনাথ বসু, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, অচ্যুতচরণ চৌধুরী, হারাধন ভক্তনিধি, অক্রূরচন্দ্র সেন, অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী, জগদ্বন্ধু ভদ্র, ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী, হরগোপাল দাস কুণ্ড, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার বিদ্যাবিনোদ ও সারদাচরণ মিত্র প্রমুখ বহু খ্যাতনামা সুধীবৃন্দের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সাহায্য এবং উৎসাহ তিনি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অক্রূরচন্দ্র সেন, জগদ্বন্ধু ভদ্র, অচ্যুতচরণ চৌধুরী ও হারাধন ভক্তনিধি তাঁহাকে অনেক সাহিত্যিক উপাদান সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন। সর্ব্বোপরি, দীনেশচন্দ্র সেন স্বীয় জাতীয় সাহিত্যের গৌরবময় স্বপ্নে বিভোর থাকিতেন এবং ইহার উদ্ধার মানসে প্রকৃত সাধকের ন্যায় স্বীয় জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। সেইরূপ একনিষ্ঠ সাধকও এখন কোথায় পাওয়া যাইবে? সাহিত্যিক উপাদান-সংগ্রহে, রচনা-নৈপুণ্যে, সাহিত্য-সমালোচনাতে ও চরিত্র-বিশ্লেষণে দীনেশচন্দ্র সেন এখনও অপ্রতিদ্বন্দ্বীই রহিয়া গিয়াছেন।

তবে, একটি কথা মনে রাখা উচিত। যিনি যত ভাল গ্রন্থই রচনা করুন না কেন তাহাতে কিয়ৎপরিমাণে ভুলভ্রান্তি অথবা দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য থাকিবেই। এইজন্য অনাবশ্যক চীৎকার করা শোভন নহে। দীনেশচন্দ্র সেন তাঁহার যৌবনে ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাসের (বিশেষতঃ টেইনের ইতিহাসের) অনুকরণে তাঁহার "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" রচনা করিয়া গিয়াছেন। মালমসলা ও বহুবিধ অমূল্য তথ্যে গ্রন্থখানি পরিপূর্ণ থাকিলেও গ্রন্থখানির কয়েকটি বিশেষত্ব

লক্ষণীয়। তাঁহার সময়ের সমালোচকগণ ভারতের প্রাচীন ইতিহাস ও সংস্কৃতিতে বৌদ্ধ প্রভাবের আধিক্য কিছু অতিরিক্ত মাত্রায় অনুভব করিতেন। দীনেশচন্দ্র সেন এই মতের প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই। সুতরাং বৌদ্ধ-দৃষ্টিতে বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রাচীন ইতিহাস লিখিতে গিয়া তিনি স্থানে স্থানে মাত্রা ছাড়াইয়া তো গিয়াছেনই এমনকি বাঙ্গলার এই যুগের সাহিত্যক্ষেত্রে মোটামুটি একটি বৌদ্ধযুগ এবং একটি হিন্দুযুগের পরিকল্পনাও করিয়া গিয়াছেন। আদি-যুগ এবং মধ্যযুগের অর্দ্ধাংশ তাঁহার মতে বৌদ্ধভাবে পরিপূর্ণ। এই সম্বন্ধে যে মতান্তরের অবসর আছে তাহা তাঁহার দৃষ্টি এড়াইয়া গিয়াছে। তাঁহার অত্যধিক ভাবপ্রবণতা এবং কবিত্বপূর্ণ মনোভাব স্থানে স্থানে সমালোচকের দৃষ্টিভঙ্গীকে অতিক্রম করিয়া যাওয়াতে তাঁহার সমালোচনা স্থানবিশেষে কিছু অতিরঞ্জন দোষযুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। প্রাচীন কবি এবং তৎরচিত গ্রন্থের কাল নির্দ্দেশে তিনি স্থানে স্থানে অসাবধানতার পরিচয়ও দিয়াছেন। তাঁহার সময়ে সংগৃহীত সীমাবদ্ধ তথ্যও ইহার আংশিক কারণ। তৎরচিত সাহিত্য বিষয়ক ইংরেজী ও বাঙ্গালা গ্রন্থগুলিতে বিভিন্ন স্থানে তাঁহার মতপরিবর্ত্তনের পরিচয়ও রহিয়াছে। যাহা হউক এইজন্য তাঁহাকে অতিরিক্ত দায়ী করিয়া লাভ নাই। তথাপি দীনেশচন্দ্র সেন প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের নির্ভরযোগ্য ও পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনায় প্রধান পথপ্রদর্শকের গৌরব চিরদিনই লাভ করিবেন।

সামাজিক, রাজনৈতিক, সাহিত্যিক প্রভৃতি যে কোন ইতিহাস রচনা করিতে গেলে সঠিক তথ্য সংগ্রহ এক কঠিন ব্যাপার। এই তথ্যগুলিদ্বারা বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া সুসম্বদ্ধ ইতিহাস রচনা করাও সহজ নহে। প্রতিপাদ্য বিষয়ের একটি বিশেষ রূপ ও বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী বিষয়-বস্তুর অন্তরালে থাকে। প্রত্যেক বিশিষ্ট লেখকের একটি স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গী আছে। সুতরাং সাহিত্যের ইতিহাস লেখকগণের প্রত্যেকের রচনার মধ্যে মতামত ও আদর্শগত কিছু পার্থক্য থাকা স্বাভাবিক। সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করিতে গেলে একটি কথা স্মরণ রাখা উচিত। সর্ব্বপ্রথম দেখা কর্ত্তব্য কোন এক বিশেষ কালের সাহিত্যের অন্তর্নিহিত মূল কথাটি কি। ইহা ধরিতে না পারিলে সাহিত্যের ইতিহাস প্রাণহীন হইবে। ইহা শুধু কতকগুলি সন-তারিখ ও ঘটনা বর্ণনায় পর্য্যবেসিত হইবে। নানারূপ তথ্য ও বিবরণ দ্বারা এক শ্রেণীর বা সময়ের সাহিত্য পরিবেষ্টিত থাকিলেও ইহার প্রাণ-শক্তির উৎসই মূল কথা। প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের মূল কথা বা মূল-সুরটি কি? আমাদের মনে হয় ইহা একটি শান্ত ও সমাহিত ধর্ম্ম-ভাব। প্রাচীনকালে এতদ্দেশীয় জ্ঞানী

ব্যক্তিগণ দৃশ্যমান জগৎ ও জীবনের বাহিরে একটি বৃহত্তর জগৎ ও উৎকৃষ্টতর জীবন কল্পনা করিয়া তাহা প্রাপ্ত হইবার জন্য সর্ব্বদা চেষ্টিত থাকিতেন। তাঁহাদের মতে এই জগৎই সব বিষয়ের শেষ নহে। তাঁহাদের এই আদর্শের প্রভাব প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে সুস্পষ্ট। একরূপ বিশেষ দার্শনিক মতবাদ দ্বারা প্রভাবিত হইয়া এই দেশবাসীগণ সংসারের দুঃখকষ্ট ভগবানে সমর্পণ করিয়া সুখ অপেক্ষা শান্তিলাভই অধিক কাম্য মনে করিত। দেশে তত অন্নকষ্ট না থাকাতে তাহারা দার্শনিক চিন্তায় মনোনিবেশ করিতে অবসর পাইত। ইহার ফলে নানা দেব-দেবীর পূজায় মনোনিবেশ করিয়াও তৎকালের বাঙ্গালী হিন্দুসমাজ যথেষ্ট সামাজিক ঐক্যবোধ এবং আনন্দলাভ করিত। এই দেব-পূজার সমারোহ ও স্তব-স্তুতির ভিতর দিয়া মধ্যযুগের বাঙ্গালা সাহিত্য আত্ম-প্রকাশ করে। ইহাদের জীবনধারায় জ্ঞান ও ভক্তি যত প্রভাব বিস্তার করে কর্ম্ম তত করে না। শাক্ততান্ত্রিক মত ও বৌদ্ধতান্ত্রিক মত জ্ঞানের পথের সন্ধান প্রথম দেয়। পরবর্ত্তীকালে বৈষ্ণব মত ভক্তির দিকে অধিক নির্ভর করে। কর্ম্মবিমুখতা এদেশবাসীর পক্ষে কতকটা জলবায়ুর গুণেও ঘটিয়া থাকিবে। পাশ্চাত্য সাহিত্যে জীবন-যুদ্ধের ও কর্ম্ম-চঞ্চলতার পরিচয় পাওয়া যায়। ইহাতে জীবন-যাত্রায় স্বল্পে সন্তুষ্টির ও আধ্যাত্মিকতার তত পরিচয় পাওয়া যায় না। পাশ্চাত্য দেশের জলবায়ু এবং অর্থনৈতিক বিশেষ অবস্থা ইহার অন্যতম কারণ বলা চলে। সত্য, শিব ও সুন্দরের মধ্যে এদেশবাসীগণ সুন্দরকেই অধিক প্রার্থনা করিয়া থাকিবে। ইহার ফলে তাহারা নানা কলাবিদ্যায় পারদর্শী হয়। আর পাশ্চাত্য জাতিগুলি জীবনের কঠোর সংগ্রাম মানিয়া লইয়া ইহাকেই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে, এবং সারা পৃথিবী ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে। তাহার ফলও শুভ হয় নাই। পাশ্চাত্য জাতিগুলির পক্ষে পরলোক অপেক্ষা ইহলোকেরই মূল্য বেশী। এই দেশের বিশ্বাস ইহার ঠিক বিপরীত।

সাহিত্যের ইতিহাস রচনায় বিভিন্ন রীতি অবলম্বন করা যাইতে পারে। ইহাদের মধ্যে প্রধান দুইটি রীতি হইতেছে দার্শনিক রীতি ও ঐতিহাসিক রীতি। এই দুইটি পথের মধ্যে ঐতিহাসিক রীতি বা পথ অবলম্বন সত্যনির্দ্ধারণ ও প্রকৃত সমালোচনার পক্ষে অধিক নিরাপদ মনে হয়। কেহ কেহ আগে সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া তদনুযায়ী উপাদানসমূহ কাজে লাগাইয়া থাকেন। ইহা মোটেই নিরাপদ নহে। ঐতিহাসিক রীতিতে ইহা বর্জ্জনীয়। দীনেশচন্দ্র সেনের উৎকৃষ্ট সাহিত্যের ইতিহাস ভিন্ন অধুনা বিশেষজ্ঞগণ কর্ত্তৃক আরও

কয়েকখানি বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস প্রকাশিত হওয়ার পরে পুনরায় আর একটি প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস রচনার প্রয়োজন কেন হইল ইহা একটি প্রশ্ন বটে। উপরের মন্তব্যগুলি হইতে ইহার কারণ স্পষ্ট বুঝা যাইবে। আমি নূতন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়া ঐতিহাসিক পদ্ধতি অবলম্বনে বর্ত্তমান ইতিহাসখানি রচনায় অগ্রসর হইয়াছি। একটু অনুধাবন করিলেই দেখা যাইবে কোন দেশের রাজনৈতিক অথবা সাহিত্যের ইতিহাস সেই দেশের ভূগোল ও জাতিতত্ত্বের সহিত বিশেষভাবে জড়িত রহিয়াছে। কোন দেশের সাহিত্যের ইতিহাসের সহিত তদ্দেশবাসীগণের রাজনৈতিক ইতিহাস এবং সমাজ ও ধর্ম্মমতের সম্বন্ধ অল্প নহে। মঙ্গলকাব্যে বর্ণিত বাঙ্গালীর সমুদ্রযাত্রা ও সমাজ-জীবন অনেক নূতন তথ্যের সন্ধান দেয়। এই বিষয়গুলির প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করা সঙ্গত নহে। মোটামুটি মৎরচিত গ্রন্থখানির বৈশিষ্ট্য নিয়ে দেওয়া গেল। গ্রন্থখানিতে আমার উদ্দেশ্য কতখানি সফল হইয়াছে তাহা সুধীবর্গের বিচার্য্য।

(১) প্রাচীন বাঙ্গালার রাজনৈতিক ইতিহাস, ভূগোল, সমাজ, ধর্ম্ম ও জাতিতত্ত্বের উপর ভিত্তি করিয়া বর্ত্তমান গ্রন্থখানি রচনা করিয়াছি। এইজন্য এই বিষয়গুলি সম্পর্কিত বিশেষ বিশেষ অধ্যায় গ্রন্থ মধ্যে নিবদ্ধ করিয়াছি। সাহিত্যিক সৌন্দর্য্য ও বিষয়বস্তু এই উভয় দিকেই দৃষ্টি রাখিয়াছি।

(২) বৌদ্ধ-ধর্ম্মের উপর অনাবশ্যক জোর দেই নাই। বরং প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে শৈব-ধর্ম্ম এবং হিন্দু-তান্ত্রিকতার বিশেষ প্রভাব দেখাইতেও চেষ্টা পাইয়াছি।

(৩) প্রাচীন সাহিত্যকে শ্রেণী (type) হিসাবে ভাগ করিয়া এক এক স্বতন্ত্র শ্রেণীর সাহিত্য একত্র গ্রথিত করিয়া আদ্যন্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছি। এই সাহিত্যকে শতাব্দী হিসাবে একস্থানে বিভাগ করিয়া দেখাইলেও এই রীতি অনুসরণ করিয়া গ্রন্থখানি লিখি নাই। মহাপ্রভুদ্বারা সাহিত্যকে তৎপূর্ব্ব, তৎসাময়িক ও তৎপরবর্ত্তী আখ্যা দিয়া তাঁহার ও নবদ্বীপের নামে চিহ্নিত করিবার প্রয়াস পাই নাই। গৌড়ের নামে অথবা হুসেন সাহ কিম্বা মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের নামে সাহিত্যিক যুগের নামকরণও সমর্থন করি নাই। এইরূপ করিবার কারণ গ্রন্থ মধ্যে যথাস্থানে আলোচনা করিয়াছি।

(৪) গ্রন্থখানি সরলভাবে রচনা করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। অনাবশ্যক উচ্ছ্বাস কিম্বা অহেতুক ভাবপ্রবণতা বর্জ্জন করিয়াছি। বিশেষ করিয়া, যথাসম্ভব

প্রত্যেক কবির জীবনী ও তৎসঙ্গে তাঁহার রচনার নমুনা দিয়া গিয়াছি। ইহাতে কবির রচনা বুঝিতে সুবিধা হইবে।

(৫) ভাষা-তত্ত্ব, অক্ষর-তত্ত্ব, ছন্দ, অলঙ্কার ও সামাজিক ইতিহাস, নানা বংশলতা প্রভৃতি অল্পপরিমাণে উল্লেখ করিয়াছি। সাহিত্যের ইতিহাসে এই বিষয়গুলির প্রয়োজন আছে কিন্তু এতৎসম্পর্কে অত্যধিক আলোচনা বর্ত্তমান গ্রন্থে কিছুটা অপ্রাসঙ্গিক মনে করি, কারণ ইহা ভাষার ইতিহাস কিম্বা শুধু সাহিত্য সমালোচনার গ্রন্থ নহে। ইহা কোন বিশেষ সময়ের সাহিত্যের উদ্ভব ও পরিপুষ্টির বিবরণসম্বলিত কবিগণ ও তাঁহাদের কাব্যসমূহ সম্বন্ধে একখানি ধারাবাহিক ইতিহাস।

(৬) এই গ্রন্থরচনার উপাদান ও ইহার উদাহরণ সংগ্রহে প্রধানতঃ ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেনের গ্রন্থগুলির উপর অধিক নির্ভর করিতে বাধ্য হইয়াছি এবং তজ্জন্য ঋণ স্বীকার করিতেছি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় অনেক মূল্যবান পুথি রহিয়াছে। এই পুথিগুলির সাহায্যও নিয়াছি। এতদ্ভিন্ন বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ গ্রন্থাগার, কোচবিহার রাজকীয় গ্রন্থাগার এবং বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগার এই সম্পর্কে উল্লেখ করা যাইতে পারে।

(৭) সাহিত্যিক ও বিষয়গত নানা জটিল প্রশ্নের নূতনভাবে সমাধানের চেষ্টা করিয়াছি এবং প্রত্যেকটি বিশেষ বিষয়ে প্রাচীন হইতে আধুনিককালের সর্ব্বশেষ সমালোচক পর্য্যন্ত সকলের মতামত যথাসম্ভব দিতে এবং কঠিন বিষয়সমূহের মীমাংসা করিতে যত্ন পাইয়াছি।

(৮) প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের অবৈষ্ণব অংশ বিশদরূপে লিখিতে চেষ্টা পাইয়াছি এবং বৈষ্ণব অংশে অনাবশ্যক ভক্তির উচ্ছ্বাস না করিয়া সাহিত্য সমালোচনার চেষ্টা করিয়াছি। নানা নূতন বিষয়ের, যথা—ইতিহাস, ভূগোল, নৃতত্ত্ব, তান্ত্রিকতা, শৈবধর্ম্ম প্রভৃতির সহিতও সাহিত্যের সংযোগ ও তৎসঙ্গে ইহাদের প্রভাব দেখাইতে প্রয়াস পাইয়াছি।

(৯) গ্রন্থখানির মধ্যে অতি আধুনিক সংবাদ দিতেও চেষ্টা করিয়াছি এবং বিভিন্ন মত নিরপেক্ষভাবে উল্লেখ করিয়া আলোচনার চেষ্টা করিয়াছি। পূর্ব্ববর্ত্তী সুধীগণের মত সর্ব্বদা অন্ধভাবে গ্রহণ না করিয়া স্বাধীনভাবে চিন্তা করিয়া দেখিয়াছি এবং স্থানবিশেষে আমার নূতন মত প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছি।

ফলকথা গ্রন্থখানি ভুলভ্রান্তিশূন্য করিতে চেষ্টার ত্রুটি করি নাই। তবুও গ্রন্থ মধ্যে উহা কিছু থাকা সম্ভব এবং এইজন্য আমিই দায়ী।

(১০) এই গ্রন্থখানি রচনা উপলক্ষে আমি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে আমাদের প্রাচীন যুগের সাহিত্য দরিদ্র নহে বরং যথেষ্ট সমৃদ্ধ। সেকালের রচনার একঘেয়েমি দোষ আছে বলিয়া একটি অভিযোগ আছে। ইহা আংশিক সত্য হইলেও আমি নানারূপ বিবরণ সংগ্রহ করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে তৎকালে বহু বিভিন্ন বিষয়ের গ্রন্থ রচিত হইত। তৎকালীন কবিগণ ও গান রচনাকারীগণের বহুমুখী প্রতিভার চিহ্নস্বরূপ সহস্র সহস্র হস্তলিখিত পুথি রহিয়াছে। আমাদের দুর্ভাগ্য যে ইহাদের একটি বৃহৎ ভাগ এখনও সুদূর পল্লী অঞ্চলে নগরের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের চক্ষুর অন্তরালে সংগোপনে অস্তিত্ব রক্ষা করিতেছে। আমাদের জাতীয় ঐতিহ্যের প্রাচীন নিদর্শন এই পুথিগুলির উদ্ধারকল্পে প্রচুর অর্থব্যয়, যথেষ্ট পরিশ্রম এবং বিরাট আয়োজন অত্যাবশ্যক। যাঁহারা মাতৃভূমিকে ভালবাসেন তাঁহারা নিশ্চয়ই এই পুথিগুলির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া এতৎসম্বন্ধে অগ্রসর হইবেন। কিন্তু এই দুরূহ কার্য্য একক সমাধান করাও সম্ভব নহে এবং ভাবিয়া দেখিলে করিবেনই বা কাহারা? সুতীব্র রবি-রশ্মিতে অন্ধপ্রায় চক্ষুর দ্বারা দূরে দৃষ্টি নিক্ষেপের ন্যায় সুদূর প্রাচীন যুগের দিকে দৃষ্টিপাত করা কঠিন বটে। এতদুপযোগী রুচি ও অর্থই বা কোথায়?

যুগে যুগে বাঙ্গালা সাহিত্য নবকলেবর গ্রহণ করিয়াছে। আদিযুগে এই সাহিত্য একদিকে প্রধানতঃ গান ও ছড়ার আকারে শৈব ও বৌদ্ধ সন্ন্যাসীগণের "চর্য্যাপদ" ও "দোহা"সমূহ এবং নাথপন্থী শৈব সন্ন্যাসীগণের "গোরক্ষবিজয়" ও "গোপীচন্দ্রের গানে"র মধ্য দিয়া বৈরাগ্য প্রচার করিয়াছে। অপরদিকে নানারূপ ছড়ার আকারে প্রচারিত "ডাক" ও "খনার বচনে"র মধ্য দিয়া গৃহস্থালীর উপযোগী মূল্যবান উপদেশসমূহ আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। কোন বিশেষ দেব-দেবীর পূজা বা স্তুতি উপলক্ষে আদি যুগের এই ছড়া ও গানগুলি রচিত হয় নাই। খৃঃ ৮ম হইতে ১১শ শতাব্দীর মধ্য পর্য্যন্ত এই জাতীয় রচনাগুলি বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রথম উন্মেষে সাহায্য করিয়াছিল।

খৃঃ ১৩শ হইতে ১৮শ শতাব্দী পর্য্যন্ত বিস্তৃত বাঙ্গালা সাহিত্যের মধ্যযুগে এই বৈরাগ্য ও গার্হস্থ্যাশ্রমের পরস্পর বিরোধী আদর্শের সমন্বয় সাধিত হইয়াছিল। যোগী শিব গৃহী হইলেন এবং শুধু শিবই নহেন এই সঙ্গে নানা দেব-দেবীর পূজা এবং দেবচরিত্র ও মানবচরিত্র বর্ণনার মধ্য দিয়া বাঙ্গালী হিন্দুর ঘরের ছবি অঙ্কিত হইল। একদিকে এই জাতীয়

সাহিত্য যেমন বাস্তবধর্ম্মী হইয়া পড়িল অপরদিকে জ্ঞানমার্গী সন্ন্যাসীগণের উপদেশাবলীর ভিতর দিয়া ক্রমশঃ বৈদান্তিক ভক্তিবাদের বিকাশ হইতে লাগিল। বিদেশীর ও বিধর্ম্মীর আক্রমণে পর্য্যুদস্ত অসহায় বাঙ্গালী ক্রমশঃ দেব-পূজায় মনোনিবেশ করিয়া ভক্তি-আকুল চিত্তে যে স্তবস্তুতি করিতে লাগিল তাহাতেই মধ্যযুগের সাহিত্যের গোড়াপত্তন হইল। মঙ্গল-কাব্য ও শিবায়নগুলি ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তান্ত্রিক জ্ঞানবাদ মাতৃকা-পূজার মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইল। বাঙ্গালার অধিবাসী মাতৃকাপূজক। তিব্বত ব্রহ্মী ও অষ্ট্রিক জাতিগুলিই ইহার প্রধান সহায়ক হইবার কথা। কালীপূজা, চণ্ডী-পূজা ও মনসা-পূজার প্রভৃতি শাক্ত পূজার মধ্য দিয়া জ্ঞান ও ভক্তি এই উভয় মতের অপূর্ব্ব সমন্বয় সাধিত হইল। এই যুগের প্রথমদিকে ধর্ম্ম-চেষ্টাই মুখ্য এবং সাহিত্য গৌণ। যাঁহারা সাহিত্যসৃষ্টি মুখ্য এবং বিষয়বস্তুর অভাবে ধর্ম্মানুগ বিষয়বস্তুর প্রচলন সমর্থন করেন প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রারম্ভিক ইতিহাস ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা তাঁহাদের অভিমত সমর্থন করে না। এই কথা নিশ্চিত যে সাহিত্য সৃষ্টির অভিপ্রায় থাকিলে কাহারও কখনও বিষয়বস্তুর অভাব হয় না।

এই যুগের প্রায় মধ্যভাগে (খৃঃ ১৫শ শতাব্দীর শেষভাগে) নবদ্বীপে যুগাবতার শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব হয়। তাঁহার আবির্ভাবের ফলে নববলে বলিয়ান বাঙ্গালার বৈষ্ণব সমাজ এক নূতন দার্শনিক মত প্রচারে মনোযোগী হয়। বাঙ্গালার নবপ্রচারিত বৈষ্ণব মতানুসারে গার্হস্থ্য ধর্ম্মে নারীর নূতন স্থান লাভ ঘটে। বৈরাগ্যের নীতির মধ্য দিয়া "পরকিয়া" মতের নারী-ঘটিত ব্যাপারও প্রচারিত হইতে থাকে এবং ক্রমশঃ জাতীর চরিত্র পৌরষহীন হইয়া পড়ে। যে তান্ত্রিকতা শঙ্করাচার্য্যের মায়াবাদ প্রচারের যুগেও জাতীয় চরিত্র বলিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছিল তাহারও ক্রমশঃ অবনতি ঘটিতে আরম্ভ করায় তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম্ম, তান্ত্রিক শৈবধর্ম্ম, তান্ত্রিক শাক্তধর্ম্ম এবং তান্ত্রিক বৈষ্ণবধর্ম্ম ক্রমশঃ উচ্ছৃঙ্খলতার প্রশ্রয় দিতে থাকে। পুরুষের এবং নারীর বলিষ্ঠতা ও দৃঢ়চিত্ততা সম্পর্কে অন্ততঃ এইটুকু বলা যায় যে অন্য ধর্ম্মগুলি ইহার যত অবনতি ঘটাইয়াছিল বৈষ্ণবধর্ম্ম সম্ভবতঃ তদপেক্ষা বেশী অবনতি ঘটাইতে সক্ষম হইয়াছিল। পৌরাণিক আদর্শে সমাজ সংস্কারও ইহার জন্য কিয়দংশ দায়ী। তবে বাঙ্গালীর যুদ্ধবিমুখতার এবং রাজা লক্ষ্মণ সেনের পলায়নের জন্য বাঙ্গালার চৈতন্য-পূর্ব্ব বৈষ্ণব ধর্ম্ম যে অন্যতম প্রধান কারণ ইহা অনুমান করা যাইতে পারে। শ্রীচৈতন্যের সময় পুরুষের "নারীভাব" বিষয়টি চূড়ান্ত পর্য্যায়ে আনিয়া

ফেলিয়াছিল। তবে সূক্ষ্মভাব ও রসবোধের দিকে বৈষ্ণব ধর্ম্ম অনেকটা অগ্রসর হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই।

এই অবস্থায় বৈষ্ণব-বিরোধী রক্ষণশীল স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণগণ খৃঃ ১৫শ শতাব্দী হইতে পূর্ণোদ্যমে পৌরাণিক আদর্শ প্রচারে ব্রতী হইলেন। এই সময়ের বহু পূর্ব্বে শূর ও সেনরাজবংশের আধিপত্যকালে কোলাঞ্চ (কান্যকুব্জ ?) হইতে পঞ্চকায়স্থসহ পঞ্চব্রাহ্মণ যেদিন বাঙ্গালাতে প্রথম পদার্পণ করেন সেই দিনটি বাঙ্গালী হিন্দুর পক্ষে বিশেষ স্মরণীয়। এই ব্রাহ্মণগণ তিন বিষয়ে বাঙ্গালী হিন্দুসমাজের পরিবর্ত্তন সাধন করেন।

(ক) তাঁহারা এই সমাজে পৌরাণিক আদর্শ প্রচারের উদ্দেশ্যে সমস্ত স্থানীয় ধর্ম্মগুলির উপর হস্তক্ষেপ করিয়া ক্রমশঃ উহাদের অনেক পরিবর্ত্তন সাধন করিলেন। অবশ্য ঐক্যপ্রদর্শন, আপোষ ও কৌশল দ্বারা তাঁহারা এই কার্য্য সাধন করিতে পারিয়াছিলেন এবং প্রথমে রাজশক্তিরও সাহায্য পাইয়াছিলেন। এইজন্য তাঁহাদের নূতন শাস্ত্র ও আদর্শ গড়িতে হইয়াছিল।

(খ) সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য বাঙ্গালার দেশীভাষাগুলির ভিতর এক নূতন প্রেরণা জোগাইল এবং বাঙ্গালা ভাষার সম্পদ বৃদ্ধি হইল।

(গ) সেনরাজগণ প্রবর্ত্তিত কৌলিন্যপ্রথা, বহুবিবাহ ও কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণবংশীয়গণের প্রতি অগাধ ভক্তিপ্রচারে নবগঠিত শাস্ত্র মুখর হইয়া উঠিল এবং ইহার ফলে জাতীয় ঐক্য সংসাধিত হইলেও জাতির প্রাণ-শক্তির অযথা অপচয় ঘটিল। এই ব্রাহ্মণগণের ভবিষ্যৎ বংশধরগণের দুর্নীতি "অষ্ট্রিক-পামিরীয়া-মঙ্গোলীয়" জাতিত্রয়ের সংযোগে প্রধানতঃ উৎপন্ন বাঙ্গালী জাতির তেজবীর্য্য, সমুদ্রযাত্রা, বৈদেশিক সম্বন্ধ ও অনেক সদ্গুণ আর্য্য আগমনে এবং প্রভাবে এইরূপে ক্রমে লোপ পাইতে বসিল।

ব্রাহ্মণগণের উক্ত প্রচেষ্টায় বাঙ্গালা সাহিত্যের নানাদিকে উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। অবশ্য সংস্কৃত শাস্ত্রের কথা তাঁহারা "ভাষাতে" রচনার প্রথমে পক্ষপাতী ছিলেন না, পরে অবস্থাগতিকে হইলেন। যাহা হউক, সংস্কৃতের অনবদ্য সাহিত্যসম্পদ বাঙ্গালা ভাষা ও ভাবের শ্রীবৃদ্ধি করিল এবং পৌরাণিক আদর্শ প্রচারের উদ্দেশ্যে নানা নূতন গ্রন্থ লিখিত হইতে লাগিল। শুধু, রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবত নহে—এই প্রচেষ্টার ফলে অনেক সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ আরম্ভ হয় এবং গদ্য রচনাও ক্রমশঃ সাহিত্যের আসরে স্থান গ্রহণ করে। খৃঃ ১৯শ শতাব্দীর আধুনিক সাহিত্য এই পৌরাণিক আদর্শের কাছেই অধিক ঋণী। যে জনসাহিত্য, লোকসাহিত্য বা গণসাহিত্য এবং ইহার

অন্তর্গত নানাবিধ পাঁচালী, যাত্রা ও কবিগান প্রভৃতি জনসাধাণের মনোরঞ্জন করিত তাহারও ইহাতে যথেষ্ট উন্নতি ঘটিল। মাতৃনামে ভাব-বিভোর শাক্ত সম্প্রদায়ের গানসমূহ এই "সংস্কার যুগে" গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অনবদ্য পদগানগুলির সহিত তুলনীয় হইতে পারে।

মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্য-শিবায়নাদি অবৈষ্ণব সাহিত্য মহাকাব্যধর্ম্মী এবং বৈষ্ণব পদসাহিত্য গীতিধর্ম্মী ইহা বলিলে বোধ হয় আপত্তির কোন কারণ নাই। অন্ততঃ মঙ্গলকাব্যে ঘটনার আড়ম্বর, পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও চরিত্র সৃষ্টি সবই মহাকাব্যের লক্ষণাক্রান্ত। সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রের অনুগামী রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক অথবা মহাপ্রভু বিষয়ক পদগানগুলি সবই যে গীতিধর্ম্মী তাহাতে সন্দেহ নাই। অনুবাদ সাহিত্যের বৈষ্ণব অংশ ভাগবতে শুধু মহাকাব্যের স্পর্শ রহিয়াছে।

অবৈষ্ণব সাহিত্যের চরিত্রগুলি আদিতে বৌদ্ধও নহে, পৌরাণিক হিন্দুও নহে। ইহারা নানা জাতির সংমিশ্রণে উদ্ভূত বাঙ্গালী জাতির মূল বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক। বিশেষ বিশেষ ধর্ম্ম এই চরিত্রগুলির মূলগত ভাব পরিবর্ত্তন করিতে পারে নাই। ইহাদের প্রকাশভঙ্গী বদলাইয়াছে মাত্র। মনসা-মঙ্গল সাহিত্যের বেহুলা-চরিত্র উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে। মৃত স্বামী পুনরুজ্জীবিত করা উপলক্ষে বেহুলা বহু কষ্ট সহ্য করিয়াছে। সতী নারীর পক্ষে মৃত স্বামীকে পুনরায় বাঁচাইবার ঘটনায় পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য আদর্শ জয়লাভ করিয়াছে। নানা পরীক্ষায় উত্তির্ণা হইয়া বেহুলা যে পাতিব্রত্যের জয় ঘোষণা করিল তাহার মধ্যেও ব্রাহ্মণ্য আদর্শ সার্থকতা লাভ করিল। ব্রাহ্মণগণ সতী নারীর কর্ত্তব্য চক্ষুতে আঙ্গুল দিয়া দেখাইলেন এবং পাতিব্রত্যের কঠোর পরীক্ষার ব্যবস্থা করিয়া নারীগণকে সচেতন করিয়া দিলেন। ইহার অপরদিকও আছে। মরা বাঁচান ও বেহুলার পরীক্ষা দান তান্ত্রিকতাগন্ধী ও তিব্বত-ব্রহ্মী সমাজের রীতি-নীতির পরিচায়ক। ইহা ছাড়া স্বামী-হারা বেহুলার প্রথম যৌবনে মৃত স্বামীসহ একা নির্ভয়ে জলপথে সুদীর্ঘকালের জন্য অনিশ্চিতের আশায় যাত্রা, নানারূপ অদ্ভুত কার্য্যসাধন এবং নৃত্যগীত দ্বারা দেবসমাজকে সন্তুষ্ট করিবার প্রচেষ্টা, নানারূপ প্রলোভন জয় ও চরিত্রের দৃঢ়তা মাতৃপ্রধান (matriarchal) সমাজের দিকে ইঙ্গিত করে। আর্য্য সমাজে এরূপ আদর্শ দুর্লভ। "সাবিত্রী-সত্যবান" কাহিনীর সাবিত্রী-চরিত্র বেহুলা-চরিত্রের কাছে ম্লান হইয়া গিয়াছে। মধ্যযুগের সাহিত্যে ব্রাহ্মণ্য আদর্শের ফলে পট-পরিবর্ত্তন হইল। খৃঃ ১৬শ শতাব্দী (মধ্যযুগ) হইতে বাঙ্গালা সাহিত্যে বর্ণিত চরিত্রগুলির

মধ্যে পুরুষের পৌরষের একান্ত অভাব দেখা যায়। ইহারা তখন জ্যোতিষ-দৈবজ্ঞ ও শাস্ত্র-বচন বিশ্বাসী। এই সময় হইতে নারীও মৃদুতায় মধুর এবং একান্তই পুরুষের উপর নির্ভরশীলা। মনসা-মঙ্গলের বেহুলা ও ধর্ম্ম-মঙ্গলের লখা-কানেড়ার যুগ তখন শেষ হইয়া গিয়াছে। অবশ্য গ্রন্থগুলি রহিয়া গিয়াছে এবং তৎসঙ্গে এই নারী চরিত্রগুলিও বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু ব্রাহ্মণ্য প্রভাবের ফলে কবিগণ আদি চরিত্রগুলি কতক পরিমাণে রূপান্তরিত করিয়া পুরুষাকারের উদাহরণের স্থলে ইহাদিগকে অদৃষ্টবাদীরূপে চিত্রিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। এই জাতীয় চরিত্রগুলির মধ্যে ধর্ম্ম অপেক্ষা জাতির প্রভাব বেশী, অন্তত: ধর্ম্মের প্রভাব পরবর্ত্তী। বর্ণিত চরিত্রগুলির কতকাংশ বৌদ্ধগন্ধী বলিয়া সক্রিয় এবং পৌরাণিক হিন্দু আদর্শে কতক চরিত্র নিষ্ক্রিয় (যথা, রামায়ণের সীতা) ইহা আংশিক সত্য হইতে পারে, সবটা সত্য নহে। নারী হিসাবে নারীর আত্মমর্য্যাদাজ্ঞান ও জাতিগত প্রকৃতি ধর্ম্মের প্রভাব অপেক্ষা অধিক প্রভাবশালী বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। তথাপি পৌরাণিক আদর্শে অনুপ্রাণিত কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণগণ বাঙ্গালী চরিত্রের ক্রমে যে পরিবর্ত্তন সাধন করিয়াছেন তাহা বিস্ময়কর বলিতে হইবে।

ভৌগোলিক ও জাতিগত পরিবেশের মধ্য দিয়া আমাদের প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য দেশের কোন্ অংশে কাহাদের মধ্যে প্রথম জন্মলাভ করে তাহা এই গ্রন্থে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। বাঙ্গালা সাহিত্যের আদিযুগে যে সাহিত্যের উদ্ভব হইয়াছিল তাহার সহিত বাঙ্গালার উত্তর প্রান্তের হিমালয়ের পার্ব্বত্য অঞ্চল এবং পামিরীয় জাতির সম্বন্ধ সম্ভবত: খুব অধিক। মধ্যযুগের বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা বলিতে "বঙ্গ" ও "রাঢ়" প্রদেশের কথা স্বত:ই মনে হয়। বাঙ্গালা সাহিত্য তখন নির্দ্দিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। এই সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য কতক অংশ মঙ্গলকাব্য এবং রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবতের অনুবাদ। চণ্ডী ও মনসার নামে প্রধান মঙ্গলকাব্যগুলি এবং রামায়ণ ও মহাভারতের অনুবাদ প্রথম অথবা প্রধান কবিগণের প্রায় সকলেরই জন্মভূমি "বঙ্গ" অথবা দক্ষিণ ও পূর্ব্ব-বঙ্গ প্রদেশ। যে জাতির মধ্যে ইহাদের উদ্ভব তাহারা বাঙ্গালার অষ্ট্রিক-মঙ্গোলীয় মিশ্রজাতি। এই সাহিত্য ক্রমে পশ্চিম-বঙ্গে বিশেষত: রাঢ়দেশে ছড়াইয়া পড়ে ও ক্রমে উন্নতি লাভ করে। মঙ্গল-কাব্যের মধ্যে মনসা-মঙ্গলের প্রথম কবি কাণা হরিদত্ত এবং নারায়ণ দেব, বিজয়গুপ্ত প্রভৃতি প্রধান কবিগণ পূর্ব্ববঙ্গবাসী ছিলেন। চণ্ডী-মঙ্গলের প্রথম কবিদ্বয় মাণিক দত্ত ও জনার্দ্দনের নিবাস সঠিক জানা যায় না, তবে উহা হয়

"বঙ্গ" নতুবা উত্তর-বঙ্গ (বরেন্দ্র)। রামায়ণের কবিগণের মধ্যে কৃত্তিবাস ছাড়া অনন্ত, চন্দ্রাবতী প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে। মহাভারতের কবিগণের মধ্যে সঞ্জয়, কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও শ্রীকরণ নন্দী প্রমুখ কবিগণ পূর্ব্ব-বঙ্গবাসী। মঙ্গলকাব্যের মধ্যে "ধর্ম্ম-মঙ্গল" শ্রেণীর কাব্যের পশ্চিম-বঙ্গে ও গৌড়ে উৎপত্তি এবং অংশতঃ পূর্ব্ব-বঙ্গে প্রচারিত এবং ইহার কবিগণও এই অঞ্চলদ্বয়ের অধিবাসী। ভাগবতের অনুবাদ প্রকৃতপক্ষে বৈষ্ণব-সাহিত্য। অবৈষ্ণব-সাহিত্য পূর্ব্ব-বঙ্গের সাহায্যে এবং বৈষ্ণব-সাহিত্য পশ্চিম-বঙ্গের প্রচেষ্টায় গড়িয়া উঠিয়াছিল। পদাবলীর চণ্ডীদাস ও ভাগবতের প্রথম অনুবাদক মালাধর বসু উভয়ই পশ্চিম-বঙ্গবাসী। যদিও বৈষ্ণব-সাহিত্য পশ্চিম-বঙ্গকেই অধিক আশ্রয় করিয়াছিল তবুও একথা বলা চলে যে মহাপ্রভু হইতে আরম্ভ করিয়া অনেক পূর্ব্ব-বঙ্গের ভক্তই নবদ্বীপে এই ধর্ম্মের প্রচার করিয়া সাহিত্য-সৃষ্টির সাহায্য করেন। অপরপক্ষে দ্রাবিড়ীদের প্রভাব গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সাহিত্যে খুব বেশী।

প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য আদিযুগে বৌদ্ধ পালরাজগণের সহানুভূতি লাভ করে। মধ্যযুগে এই সাহিত্য হিন্দু সেনরাজগণের সাহায্য পাইয়া গড়িয়া উঠে। গৌড়রাজগণের সাহায্য প্রাপ্ত হওয়াতে তাঁহাদের রাজ্যান্তর্গত রাঢ়দেশে এই সাহিত্যের প্রচুর চর্চ্চা হইতে থাকে। বাঙ্গালাদেশে আর্য্যসভ্যতা সর্ব্বপ্রথম গঙ্গা নদীর দুই তীর আশ্রয় করিয়া পশ্চিম হইতে ক্রমে পূর্ব্বদিকে বিস্তৃত হয়। আর প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য পরবর্ত্তীকালে রাজনৈতিক কারণে উত্তর ও পূর্ব্বদিক হইতে পশ্চিমদিকে রাঢ়দেশে অনেক পরিমাণে ছড়াইয়া পড়ে। তখন উত্তর-রাঢ়দেশ আর্য্যসভ্যতার কেন্দ্ররূপে গণ্য হয়। গৌড়ে অবস্থিত রাজশক্তি রাঢ়ের সন্নিকটে বিরাজ করিতেছিল। গঙ্গার প্রধান খাত অনুসরণ করিয়া এবং পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ও বঙ্গভেদ না করিয়া গৌড়ের রাজশক্তি প্রথমে হুগলী বা ভাগীরথী নদীর দুই তীর দিয়া এবং নবদ্বীপকে কেন্দ্র করিয়া আর্য্যসভ্যতা প্রচারের চেষ্টা করে। তমোলুকের সামুদ্রিক বন্দর এবং সাগর-সঙ্গম তীর্থস্থান ভাগীরথীর মাহাত্ম্য প্রচারে ও আর্য্যসভ্যতা বিস্তারে সেনরাজগণকে উৎসাহিত করে। ইহার ফলে প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য এই অঞ্চলে এত সমৃদ্ধ হইয়া উঠে যে এক এক সময় মনে হয় বুঝি এই সাহিত্যের জন্মই এইখানে। সম্ভবতঃ তাহা ঠিক নহে।, যাহা হউক, 'বঙ্গদেশ' ও পূর্ব্ববঙ্গ প্রাচীনবাঙ্গালা সাহিত্যের প্রধান পীঠস্থান এবং রাঢ়দেশ পূর্ব্ব-বঙ্গের উদ্ভাবিত এই সাহিত্যের সমর্থক ও সমৃদ্ধিসাধক বলা যাইতে পারে। এই যুগের

বাঙ্গালা সাহিত্য পুনরায় পশ্চিম-বঙ্গের কলিকাতা অঞ্চল হইতে পূর্ব্ব-বঙ্গের দিকে অগ্রসর হইতেছে। কালের কুটিল গতিতে বাঙ্গালা সাহিত্যের আরও কত পরিবর্ত্তন হইবে কে বলিতে পারে!

বর্ত্তমান গ্রন্থখানি আমার বহু বৎসরের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল। ইহাতে নানারূপ ত্রুটি ও মতানৈক্য থাকাও নিতান্ত স্বাভাবিক। তবে, প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য সম্বন্ধে আমি যেরূপ চিন্তা ও গবেষণা করিয়াছি তাহারই রূপটি অকপটে পাঠকবর্গ ও জিজ্ঞাসুর গোচর করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। আমার সিদ্ধান্তে কোনরূপ ভুল থাকিলে অবশ্য আমিই দায়ী। এতদ্ভিন্ন গ্রন্থখানি মুদ্রণকালে আমার প্রুফ সংশোধনের অপটুতার ফলে ও অনবধানতাবশতঃ কতকগুলি ভ্রমপ্রমাদ রহিয়া গিয়াছে। এই সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্যও আমারদিকের দায়িত্ব দুঃখের সহিত স্বীকার করিতেছি। যাহাহউক বোধগম্য সাধারণ বর্ণাশুদ্ধি ভিন্ন বিশেষ বিশেষ ভুলগুলি গ্রন্থপাঠের সুবিধার জন্য একটি ভ্রমসংশোধনের তালিকায় নিবদ্ধ করিলাম। আশা করি এই সমস্ত ভুলত্রুটি সত্ত্বেও বিষয়বস্তুর গুরুত্ববোধে সহৃদয় পাঠকবর্গের সহানুভূতি ও উৎসাহ হইতে বঞ্চিত হইব না।

এই গ্রন্থমধ্যে যে সাতখানি চিত্র সংযুক্ত হইল, তাহা সমস্তই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুগ্রহে প্রাপ্ত। এই চিত্রগুলি আমার গ্রন্থমধ্যে নিবদ্ধ করিতে অনুমতি দেওয়াতে আমি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষকে আমার বিশেষ ধন্যবাদ জানাইতেছি।

মৎপ্রণীত প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের এই ইতিহাসখানি অনুগ্রহ করিয়া গ্রহণ ও মুদ্রিত করাতে মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলারসহ কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষকে আমার অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। এই উপলক্ষে বিশেষভাবে অনারেবল জষ্টিস শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম্.এ, এল্-এল্.বি., ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম্.এ. এল্-এল্. বি., ডি.লিট., এল্-এল্.ডি., ব্যারিষ্টার-এ্যাট্-ল, এম্.পি., শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ এম্.এ., (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন রেজিষ্ট্রার) এবং ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম্.এ., এল্-এল্.বি, পি-এইচ.ডি. (রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক) মহোদয়গণের নিকটও আমার অপরিশোধনীয় ঋণ স্বীকার করিতেছি। এই পরম শ্রদ্ধেয় মহোদয়গণের সহানুভূতি ও সাহায্যেই এই গ্রন্থমুদ্রণ সম্ভব হইয়াছে। এই গ্রন্থপ্রকাশে উৎসাহিত করিবার জন্য শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র

বন্দ্যোপাধ্যায় বি.এ. (কঃ বিঃ এ্যাসিষ্টাণ্ট রেজিষ্ট্রার) মহাশয়কেও আমার শুভেচ্ছা জানাইতেছি।

পরিশেষে গ্রন্থখানি সুচারুরূপে মুদ্রণের জন্য শ্রীসরস্বতী প্রেসের কর্ম্মীবৃন্দকে এবং বিশেষ ভাবে এই প্রেসের পক্ষে শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ গুহরায় বি.এ. ও শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়দ্বয়কে এবং আমার প্রাক্তন ছাত্র স্নেহাস্পদ শ্রীবারীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম.এ.কে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। ইতি—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, } **শ্রীতমোনাশ চন্দ্র দাশ গুপ্ত**

চিত্র-বিবরণী

১। শ্রীচৈতন্য-সংকীর্ত্তন, খৃঃ ১৭শ শতাব্দী (১ম পৃষ্ঠার পূর্ব্বে)
২। প্রাচীন অক্ষরের প্রতিরূপ (৩২শ পৃষ্ঠা)
৩। প্রসন্ন-বুদ্ধ, খৃঃ ১১শ শতাব্দী (৩৯শ পৃষ্ঠার পূর্ব্বে)
৪। হর গৌরী, খৃঃ ১১শ শতাব্দী (৮৭ পৃষ্ঠার পূর্ব্বে)
৫। মনসা দেবী, আনুমানিক খৃঃ ১০ম শতাব্দী (১৩৭ পৃষ্ঠার পূর্ব্বে)
৬। মনসা-মঙ্গলের পট, খৃঃ ১৯শ শতাব্দী (২৭৫ পৃষ্ঠার পূর্ব্বে)
৭। বিষ্ণু মূর্ত্তি, খৃঃ ১১শ শতাব্দী (৫২০ পৃষ্ঠার পূর্ব্বে)

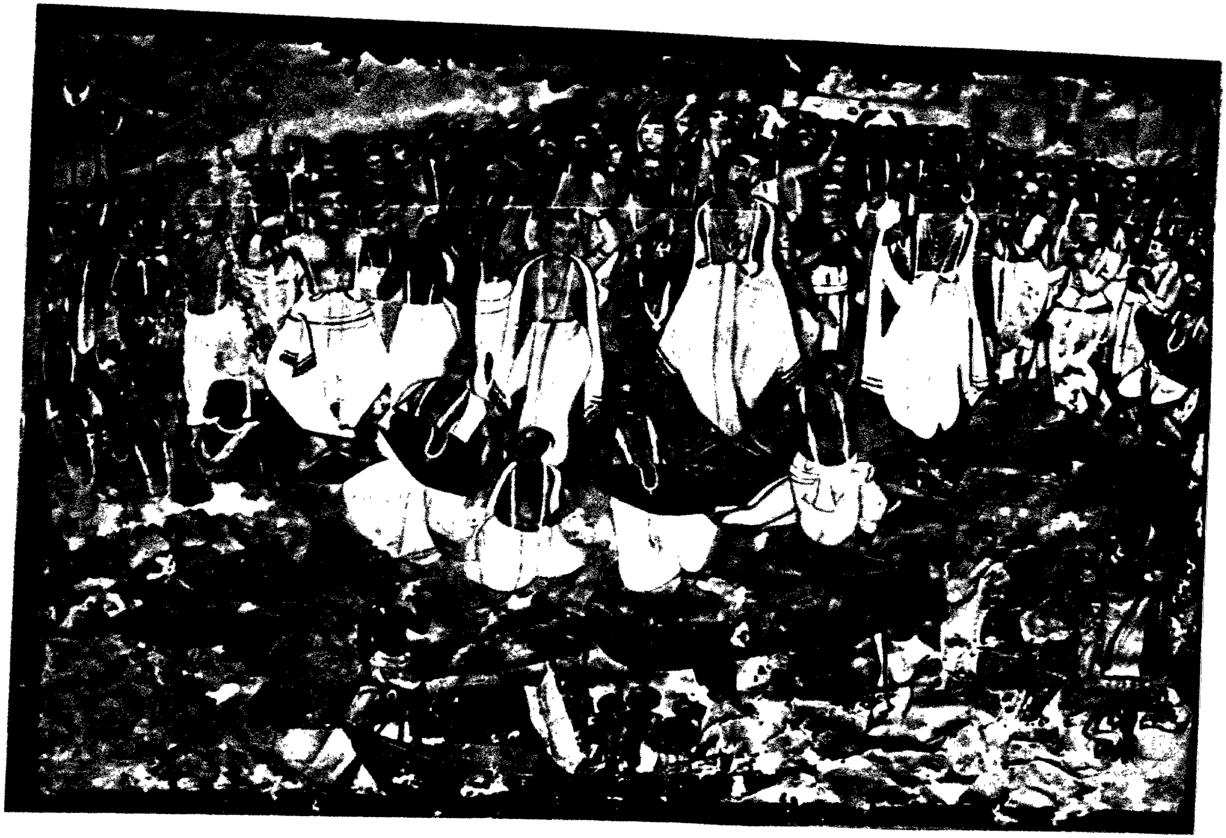

শ্রীচৈতন্য সংকীর্তন

কাগজে অঙ্কিত। [illegible]